রসে বশে
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা

দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশীপুরে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

আমাদের কাছে ঠাকুর আর মায়ের মতো আপনজন আর কেউ নেই। প্রতিমুহূর্তে, প্রতিপলে তাঁদের কথাই তাই মনে আসে। মহাভারতে দেখতে পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বুঝলেন, লীলা সম্বরণ করে তাঁর ফিরে যাবার সময় হয়েছে তখন তিনি তাঁর প্রিয়জনদের বর দিতে চাইলেন। সকলেই যে যার ইচ্ছেমতো বর চেয়ে নিলেন সব শেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীকে জিগ্যেস করলেন, বুয়া তুমি কিছু চাইবে না? কুন্তী বললেন, আমায় তুমি এমন বর দাও যাতে প্রতি জন্মে, তা সে শুকরযোনিতেও হোক, আমি যেন সব সময় দুঃখের মধ্যে থাকি।

আশ্চর্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সে কী পিসিমা, তুমি তো জন্মদুখিনী। বিয়ের আগেও তোমার দুঃখের শেষ ছিল না (কর্ণের জন্ম এবং তাকে পরিত্যাগ করা), বিয়ের পরেও শুধু দুঃখই পেয়েছ, এখনও পাচ্ছ। তবু তুমি দুঃখ চাইছ?

কুন্তী বললেন, যখনই দুঃখ পেয়েছি তখনই যে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে 'হা কৃষ্ণ'— তোমার নাম। তোমার নামই যে আমি সব সময় করতে চাই। তাই দুঃখ চাইছি।

তথাস্তু। আমি যখনই মর্ত্যে আসব— তুমিও তখন আমার সঙ্গে আসবে।

তাই তো আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে চন্দ্রমণিদেবী যখন দেহত্যাগ করলেন তখন ঠাকুর তাঁর দু'পা ধরে বলছেন— তুমি কে মা, আমাকে পেটে ধরেছ!

আবার মা সারদা বললেন, যখনই দুঃখ পাবে তখন জেনো আর কেউ না থাকুক তোমার একজন মা আছেন।

ঠাকুর আর মা এইভাবে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বারবার দেখিয়ে দিয়েছেন, ধর্মরক্ষার জন্যে তাঁরা যখন ধরাধামে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে আসতে হয় কলমির দলকেও। ঠাকুর কাশীপুরে একদিন লক্ষ্মীদিদিকে এই কথাই বলেছিলেন।

জন্মের পর থেকেই আমি রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে বড়ো হয়েছি। আমার এক মামা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্র পেয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী বাসুদেবানন্দ। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর। শ্রীশ্রীমা এবং ঠাকুরের সন্তানদের কাছ থেকে দেখেছিলেন। আবার আমার বাবা, মা ও বড়ো দাদা ছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত। খুবই ছোটবেলা থেকে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমার কাটত টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী দয়াঘনানন্দজির কাছে। তাঁকে আমি সনৎদা বলে ডাকতাম। টাকি আশ্রমের উল্টোদিকে আমাদের একটি বাগানের এক কোণে শ্রীশ্রীমায়ের নামে ছোটো একটি আশ্রম ছিল। সেখানে আশাদি, কালোদি, কমলাদি, কল্যাণীদিরা থাকতেন। সনৎদার কাজের চাপ পড়লে বা কেউ এলে তিনি আমায় মায়েদের কাছে দিয়ে আসতেন। তখন আমি ওঁদের কাছে থাকতাম। ওদের কোলে চড়ে

ঘুরে বেড়াতাম। ওঁরাই পরে সারদা মঠের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তবু ইচ্ছে করলেও ঠাকুর কিংবা মাকে নিয়ে লিখতে সাহস পেতাম না। শেষ পর্যন্ত আমার এক সাহিত্যিক দাদা শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতির অনুপ্রেরণায় লিখতে শুরু করেছি। এই লেখাগুলি প্রধানত দক্ষিণেশ্বরের পত্রিকা 'মাতৃপূজা'য় প্রকাশিত হয়েছে শ্রী কুশল চৌধুরি ও শ্রীগুরুপ্রসাদ মহান্তির সহায়তায়। ওঁদের সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

বইটি তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। মথুরানাথ ও চন্দ্রমণি দেবীর ইহলোক ত্যাগ। শ্রীশ্রী ঠাকুরের খড়দহে গমন এবং শ্রীশ্রীমায়ের তারকেশ্বরে হত্যে দিতে যাওয়া এবং মহাকালের সংকেতের কাহিনি। বইটিতে কিছু অজানা তথ্য সংযোজিত হয়েছে যা ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের ওপর যাঁরা গবেষণা করতে আসবেন তাঁদের কাজে লাগবে।

শ্রীশ্রীমায়ের তারকেশ্বরে হত্যে দিতে যাবার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু মা কীসে গিয়েছিলেন— সে বিষয়ে কোনো তথ্য ছিল না। বেলুড়মঠ, গোলপার্কের কালচার, উদ্বোধন এবং যোগোদ্যানে গিয়ে বর্ষীয়ান সাধুদের কাছে জিগ্যেস করেও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। লাইব্রেরিতেও সেরকম কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু এবং ইস্টার্ন রেলের অফিসার শ্রী তপন কুমার দাস তারকেশ্বর রেল স্টেশনে রাখা ফলক থেকে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ইচ্ছে করেছেন বলেই এই অজানা তথ্য এতদিনে উন্মোচিত হল। আমি শুধু লিখেছি, আসল কৃতিত্ব কিন্তু তপনের।

বইটি যদি সকলের ভালো লাগে, তাহলেই আমাদের গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সার্থক হবে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিত্যানন্দ-শ্যামসুন্দর

॥ এক ॥

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছেন রামকৃষ্ণ। কুলকুল করে বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। নির্মেঘ আকাশে একখণ্ড সাদামেঘ পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে কথা হারিয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

মাস্টার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের দিকে। এই তো ছিলেন এখানে, এখন কোথায়! মাস্টার ভালোভাবেই জানেন উনি এখন আর দক্ষিণেশ্বরে রানির মন্দিরে নেই। তাহলে কোথায় তিনি? হদিস পান না ডাকসাইটে মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। লোকে বলে ছেলেধরা মাস্টার। ছাত্রদের মধ্যে কাউকে মনে ধরলেই হল। ঠিক এনে হাজির করবেন রামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রানির মন্দিরে রামকৃষ্ণের কাছে এসেই সব পথের শেষ। যে আসবে সে উদ্ধার হয়ে যাবে। তাই তো ভালো আধার মনে হলেই তাকে টেনে আনেন এখানে। তাঁর নাম যে ছেলেধরা মাস্টার হয়ে গেছে, সে খবরও তিনি রাখেন না। রাখার সময়ই বা কোথায়। সবসময় যে উন্মুখ হয়ে থাকেন 'তব কথামৃত' শ্রবণের জন্য।

কিন্তু ঠাকুর আজ কোথায়? ওই তো বসে আছেন সামনে। তিনি আছেন। কিন্তু নেই। মাস্টার থই পান না। চাতক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেন। যত নষ্টের গোড়া ওই বুড়ো মণি মল্লিক। পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে শোকের কলশি খালি করে ফেলেছিল মণি। ঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিলেন না। একটা কথাও বললেন না। হঠাৎ তাল ঠুকে উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন,

জীব সাজো সমরে
ঐ দ্যাখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহা পুণ্যরথে
ভজন সাধন দুটো অশ্বজুড়ে,—
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান
ভক্তি ব্রহ্মবাণ..... (সংযোগ করো রে)।।

ভক্তিব্রহ্ম শব্দটি মুখ দিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাধিস্থ ঠাকুর। নিশ্চল শরীর, নিস্পন্দ। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, ভাগ্নে হৃদয় এসে ধরে ফেলে বসিয়ে দিল। কিন্তু সমাধি ভাঙার কোনও লক্ষণই নেই।

থাকবে কী করে? তিনি যে এখন জ্যোতির্ময় পথ ধরে নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছেন। পার হলেন এ বিশ্ব, পার হলেন জ্যোতিষ্কলোক, ক্রমে চলে এলেন সূক্ষ্মতর ভাবলোকে। আরও ওপরে উঠছেন তিনি। দেখছেন, দু'পাশে বসে আছেন দেব-দেবীরা। তবু ক্ষান্ত

হল না তাঁর ঊর্ধ্বগতি। চলে এলেন ভাবরাজ্যের চরম চূড়ায়। সেখানে একটি জ্যোতির রেখা খণ্ড-অখণ্ডের রাজ্যকে আলাদা করে রেখেছে। সে যে দ্বৈত আর অদ্বৈতের দেশ। অখণ্ডের রাজ্যে এসে ঢুকলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে দেব-দেবীদেরও প্রবেশাধিকার নেই। সাতজন ঋষি ধ্যানে লীন হয়ে আছেন। সহসা দেখলেন, অখণ্ডলোকের পরিব্যাপ্ত জ্যোতিপুঞ্জের কিছু অংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেবশিশুর আকার নিল। সেই শিশু দু'হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল এক ঋষির। ধ্যানভঙ্গ হল ঋষির। আনন্দময়, অনিমেষ চোখে দেখতে লাগলেন শিশুটিকে। শিশুটি বললেন, আমি চললাম। তুমিও এস।

— কোথায় চললে?

— মর্ত্যে?

মাথা নাড়লেন ঋষি।

নড়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, নরেন? নরেন কোথায় গেল?

এগিয়ে এলেন মাস্টার। বলেন, সে তো অনেকক্ষণ চলে গেছে।

চলে গেছে! হাসি খেলে গেল রামকৃষ্ণের মুখে। চাপাগলায় বললেন, কোথায় আর যাবে? ঘুরে ফিরে তাকে যে এখানেই আসতে হবে।

— কিছু বলছেন?

— না, না কী আর বলব, ভাবলোকের চাবি যে আমার ট্যাকে গোঁজা! ও যে পরিপূর্ণ জ্ঞান।

— কে, কার কথা বলছেন?

— কার আবার, নরেনের। ওর জ্ঞান আমার প্রেম। না মিললে কি কিছু হয়!

মাস্টার কিছু বুঝতে পারেন না। ভাবেন, তাঁর প্রাণের ঠাকুরের ভাবসমাধির অবস্থা পুরো কাটেনি। এখনও তিনি আপনাতে মগ্ন। চোখের পলক পড়ে না। তাকিয়ে আছেন ঊর্ধ্বলোকের দিকে। মাস্টারমশাই বুঝতে পারেন, সদাজাগ্রত কুলকুণ্ডলিনী। মানুষের শরীর হলেও উনি নররূপধারী ভগবান। দু'হাত জোড় করে তিনি বসে থাকেন। বড়ো ইচ্ছে হয় জানতে, কোথায় যান উনি। সে রাজ্যে কি প্রবেশাধিকার নেই কারও? হৃদয়রাম এসে উঁকি দিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ছোটোমামার?

মাস্টার অসহায়ের মতো তাকালেন। বললেন, জানি নে কী হয়েছে, জানিনে উনি কোথায় আছেন? এইটুকু শুধু জানি এই মর্ত্যধামে উনি নেই। তুমি একটু দেখো না ভাই, যদি ফিরিয়ে আনতে পার।

— কোনো চিন্তা নেই। এসে যাবে, এসে যাবে। আমায় এখন মন্দিরে যেতে হবে। কত কাজ।

মাস্টার ঠিক করলেন, তিনি আর নড়বেন না। ঠায় বসে থাকবেন। জিজ্ঞেস করবেন, কোন সে অচিন রাজ্যে হারিয়ে যান তিনি? কী দেখেন, কী শোনেন? কেন তাঁর শরীর পুলকিত হয়ে ওঠে? কেন ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে চাপা অথচ স্বর্গীয় হাসি? আজ আর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে নড়বেন না তিনি। কাল সকালে উঠে সোজা চলে যাবেন তাঁর স্কুলে। ক'টা ছেলের ওপর তাঁর চোখ পড়েছে। তাদের ওপর নজর রাখতে হবে।

একদিন ধরে আনতে হবে রানিমার মন্দিরে। তাঁর দায়িত্ব তো ওইটুকুই। বাকি কাজ ঠাকুর রামকৃষ্ণের।

একটি জিনিস মাস্টার লক্ষ করেছেন, নরেনকে দেখলে ঠাকুর যেন বিগলিত সারল্যের মানস সরোবর হয়ে যান। দাও, যে ক'টা ডুব দিতে পার দাও।

নরেন বলবে, না মশাই, আমার ওতে কাজ নেই।

তোর সে দরকারও নেই রে! তারপর নিজের মনে বলেন, তুই যে কে তা তো জানিস না। যে দিন জানতে পারবি সেদিন আর ওই শরীর থাকবে না। তাই খুঁটিটা বেঁধে রাখলাম। একটু একটু করে দড়ি ছাড়ব। তোর কাজ যে দিন শেষ হবে সেদিন দেখবি খুঁটি নেই, দড়িও নেই। তুই চিনতে পারবি নিজেকে। তখনই ফিরে যাবি নিজ-নিকেতনে।

মন্দির থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি। মায়ের আরতি হচ্ছে। কিন্তু মা যে এসে এখানে বসে আছেন তা আর কে জানে। হাসলেন রামকৃষ্ণ। দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন।

অবাক মাস্টার ভাবেন, উনি আবার কাকে প্রণাম জানাচ্ছেন?

মাস্টারমশাই পকেট থেকে নোটবুক আর পেন নিয়ে লিখতে লাগলেন। আজ যার মুখ দেখে ঘরে ঢুকেছেন, সে মুখ যেন তিনি রোজই দেখেন। অন্যদিন বাড়ি ফিরে ডায়েরি লেখেন। আজ এখানেই লিখে নিলেন।

॥ দুই ॥

— অ হৃদে এ বলে কী রে!

— কী ছোটোমামা?

— আমায় খড়দায় নিয়ে যাবে রে।

— সেখানে আবার কী!

— সেখানে শ্যামসুন্দর আছেন না?

শ্যামসুন্দর... হৃদয় মনে করতে পারছে না। বলে, শ্যামসুন্দর সে আবার কে.... তাকে চিনবে কী করে?

— তুই থাম হৃদু, তুই কী যে বুঝবি.... ওই তো বোঝে। স্বয়ং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর... কী জ্ঞানী... কত বিদ্যে... তুই, তুই অবিদ্যের ঝাড়। যা যা যেখানে যাচ্ছিস যা।

যাদবকিশোর দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখেমুখে প্রত্যাশা। ঠাকুর যাবেন তাঁদের বাড়ি। দর্শন করবেন শ্যামসুন্দরকে।

রামকৃষ্ণ হাসছেন। তাঁর দুধবরণ রং, দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তি। যাদবকিশোর চমকে ওঠেন। চোখের সামনে কে ইনি? এ কাকে দেখছেন তিনি? এ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। চোখের পলক পড়ে না।

সহসা যেন আপনাতে আপনি ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, তোমার আবার কী হল যাদব?

প্রভু... আপনি.... আপনি.... মুখ দিয়ে কথা সরে না যাদবকিশোরের। রামকৃষ্ণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাদব, যাবই তো। শ্যামসুন্দর যে আমায় ডেকেছেন। না গিয়ে কি আমি পারি?

দুহাত তুলে নেচে উঠলেন যাদবকিশোর। বললেন, আমাদের কুঞ্জবাটি এবার ধন্য হবে প্রভু।

তা কীসে যাব যাদব? রামকৃষ্ণ যেন শিশু। তর সয় না তাঁর। বলেন, বললে না তো কীসে যাব!

— নৌকোয় যাওয়াই তো ভালো প্রভু। দক্ষিণেশ্বরের ঘাট থেকে উঠবেন, নামবেন আমাদের কুঞ্জবাটির ঘাটে।

— সেই ভালো, সেই ভালো। ছ্যাকড়াগাড়ির চেয়ে ভালো। তা কবে নিয়ে যাবে যাদব?

— শ্যামসুন্দরের ঝুলনের সময়।

— তা বেশ! তা বেশ! কবে তোমাদের সেই ঝুলন?

রামকৃষ্ণের উদগ্রীব প্রশ্ন।

— শ্রাবণ মাসের ১৪ তারিখে (১২৮১)।

হৃদয়রাম মন্দির থেকে বেরিয়ে খাজাঞ্চিখানার দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই রামকৃষ্ণ ডাকলেন, ওরে হৃদে! শুনে যা, শুনে যা...

— আবার কী হল?

— যাদব আমায় শ্রাবণ মাসে শ্যামসুন্দরের ঝুলনের সময় খড়দায় নিয়ে যাবে।

— তুমি কি এখন থেকেই তৈরি?

— তা তৈরি হতে হবে না? কত দূর বল। নৌকায় করে যাব।

— কী এমন দূর ছোটোমামা! পেনেটির (পানিহাটি) পরেই তো খড়দহ। তাই না পণ্ডিত?

মাথা নাড়েন যাদবকিশোর। হৃদয়রাম হেসে বলেন, দেখলেন তো কেমন মানুষ। সত্যি ছোটোমামা, তোমার উঠল বাই তো কটক যাই।

— তুই যা তো, যেখানে যাচ্ছিস যা। যাদব পণ্ডিত মানুষ। ওর কথার তুই কী বুঝবি রে?

হঠাৎ যাদবকিশোরের দিকে চোখ পড়ল রামকৃষ্ণের। তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই দেখে লজ্জিতভাবে রামকৃষ্ণ বললেন, এ কী যাদব, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো বসো।

— প্রভু, আমি এবার আসি। আমার আবার...

— ও হ্যাঁ, এসো এসো। তোমার আবার... তা ভুলে যেওনা যেন যাদব ঝুলনের সময় তোমাদের বাড়ি যাব। শ্যামসুন্দরকে দেখব.... শ্যামসুন্দরকে.... শ্যাম...

আনমনা হয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ। থেকে থেকে কোথায় যে চলে যান। এই আছেন, এই নেই। যাদবকিশোর নড়তে পারছেন না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। মাস্টারমশাই কখন যে এসে চুপ করে বসে আছেন কেউ খেয়াল করেন নি। তাই তাঁর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন রামকৃষ্ণ, ভক্তের লক্ষণ কী?

রামকৃষ্ণ তাকালেন যাদবকিশোরের দিকে। তারপর মাস্টারকে লক্ষ করে বললেন, শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন শোনো, আমার বিগ্রহ ও আমার ভক্তকে দর্শন, অর্চন আর পরিচর্যা, স্তুতি আর গুণকর্মের অনুকীর্তন, আমার কথা শুনতে শ্রদ্ধা, আমাকে অনুধ্যান, আমাকে লব্ধ বস্তুর সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন, আমার জন্মকর্মকথন, আমার পূর্বানুমোদন। অমান্বিত্ব, অদম্ভিত্ব আর নিজে সে কী করছে তার পরিকীর্তনে অস্পৃহা।...

এই ভক্তি লাভ হবে কী করে? যাদবকিশোরের প্রশ্ন।

— একমাত্র সাধুসঙ্গে। আর...

— আর কী ?

— ভগবদ্‌বিরহ। একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ থেকেই একান্ত ভক্তিলাভ হয় মহাসৌভাগ্যবতী বলে ব্রজাঙ্গনাদের সম্বোধন করেছিলেন উদ্ধব। বলেছিলেন, বিরহে তোমরা শ্রীকৃষ্ণে সর্বাত্মভাবে অধিকৃত হয়েছ...

এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। ভক্ত আর ভগবান এক হয়ে যাওয়া। সোজাপথ তাই সাধুসঙ্গ। ভক্তিলাভের সহজ উপায়।

॥ তিন ॥

তোদের খ্যাপার হাটবাজার মা (তারা)।
ক'ব গুণের কথা কার মা তোদের।।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার।
মণি-মুক্তা ফেলে পরিস গলে নরশির-হার।।
শ্মশানে-মশানে ফিরিস কার বা ধারিস ধার।
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার।।

নিজের মনে হাততালি দিতে দিতে গাইছিলেন রামকৃষ্ণ। সামনে গঙ্গা। নহবত থেকে একজোড়া উন্মুখ চোখে, কান খাড়া করে শুনছেন আর দরমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছেন যদি একটু দেখা যায়। যদি একবার দর্শন মেলে। সারদা আছেন সেখানে। কত কাজ তাঁর। রামকৃষ্ণের জন্যে রান্না করা, সিঙ্গি মাছের ঝোল বানানো, পেটরোগা মানুষতো, দুধ জ্বাল দেওয়া— কত কাজ, কত কাজ। কিন্তু সারদার কাছে এ কোনো কাজ নয়, এ যে তাঁর পূজা।

ফলহারিণী কালীপুজোর দিন স্বয়ং রামকৃষ্ণ কালীজ্ঞানে যাঁকে পুজো করেছেন, যাঁর পায় অর্ঘ্যপ্রদান করেছেন তিনি অন্তঃপুরবাসিনী মা সারদা। নহবতের দরমার বেড়ার ফুটোর মধ্যে দিয়ে সারদা ঠাকুরের ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকেন যদি একবার দেখা যায়, কান পেতে থাকেন— যদি ওঁর মধুর সংগীত শোনা যায়। এক একদিন সারদার ইচ্ছে পূর্ণ হয়। বেশিরভাগ দিনই হয় না।

অথচ সারদার ব্যাপারে রামকৃষ্ণের জ্ঞান টনটনে। রূপ লুকিয়ে এসেছেন জগজ্জননী। তাই সাবধান করছেন ভাগ্নে হৃদয়রামকে। বলছেন, আমায় যা বলছিস বল। কিন্তু ভুলেও ওকে কিছু বলে বসিসনি যেন। ও চটলে এই রামকৃষ্ণ তো কোন ছার, বিধিরও সাধ্য